ড. ইশা মোহাম্মদ

জাতীয় শিক্ষা বনাম দরিদ্রের উচ্চশিক্ষা

আছে। শিক্ষানীতি নেই। শিক্ষা কতটা আছে তাও ভাবার বিষয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাভীতি প্রবল। দুই. শ্রেণীনামিরা চায় আপামর পাবলিক শিক্ষিত হয়ে সমস্যা বাড়িয়ে দিক। দ্বিতীয়টা মিছে কথা হলে প্রথমটার ব্যাপারে সাধারণভাবে একমত হওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না। শিক্ষাভীতি কেন ...র হয়, অপনোদনের উপায় কী? তা নিয়ে ...র গবেষণা হয়েছে, মীমাংসায় উপনীত হওয়া ...নি। একটি মত বেশ আলোড়ন তুলেছিল ...তমহলে। মতামতের সার কথা হল, প্রত্যেক ...সত্তার নিজস্ব পাঠক্রম থাকতে হবে, যা তার ...জ চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ। ...জ চরিত্র নির্ণয় করা কঠিন। উচ্চশিক্ষার ...ত্র দেশ বিদেশ বিভেদ জ্ঞান করলে উচ্চশিক্ষা ...শিক্ষা হয়ে যায়। বিশ্বায়নের এ দিনে যারা ...র শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া গোঁ ধরবে তারা ...ারই হবে, মানুষ হবে না। বিশ্ববাজারে ...ক্রর' যোগ্যতা হারাবে। আর ভদ্রলোকদের ...লা হবে। তাই যার যার 'দেশভাব' নিয়ে ...কোর করলে বিশ্বজনীনতার বিচারে শিক্ষিত ...া সম্ভব নয়। তারপর 'দেশ-কাল-পাত্রের' ...ব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও প্রধান হিসাব। ...ীয় শিক্ষানীতির রূপকাঠামো তেমনই হবে, ... জাতি নির্মাণের জন্য 'প্রজন্মকে' শিক্ষিত ...র কৌশলও তদানুরূপ হবে যেমনটি জাত ...াজন হিসেবে শনাক্ত করবে। জাতির ...াজন কীভাবে নির্ণিত হবে?

...ীয় শিক্ষানীতিকে কোন না কোনভাবে ...হারিক করার কাজে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেমন ...কা পালন করতে পারে, তেমনি উচ্চশিক্ষার ...াপীঠগুলো দায়িত্ব পালনে প্রাগ্রসর ভূমিকা ...ন করতে পারে। বিদ্যাপীঠগুলোর নিজস্ব ...মের কিছু শিক্ষাবৈশিষ্ট্য থাকে। প্রতিটি সভ্য ...ার উচ্চশিক্ষার প্রতিটি বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য ...ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন ইংল্যান্ডের ...মব্রিজ আর অক্সফোর্ড একই শিক্ষা ...ষ্ট্যমণ্ডিত নয়, অনেকটা তেমনি। প্রাচীন ...ায় দেখা গিয়েছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ...টিই নিজস্ব ঢঙের শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা ...। এখন তেমন জাতীয় ভাববাদী শিক্ষা ...বারেই মূল্যহীন। তবে স্থানিক চরিত্রের ...ানমণ্ডিত শিক্ষা কার্যক্রমকে অবহেলা করার ...ন দেখানোর সাহস কারোরই এ পর্যন্ত হয়নি।

সেটি কী?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ধনী-দরিদ্র উভয়কেই একই শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য। একই প্রকার শিক্ষা কি তারা সবাই চায়? চায় না। কিন্তু উপায় নেই। প্রয়োজন চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষা বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটানো জাতীয় শিক্ষা অনুশীলনের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় শিক্ষা কারিকুলাম স্থানিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর ফলে দেশের প্রয়োজন যেমন পূরণ করা সম্ভব হয়, তেমনি আন্তর্জাতিক মানসশ্রম চাহিদা প্রতি-প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়। যে কোন গণভিত্তিক দেশে বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চশিক্ষায় বিকেন্দ্রীকৃত হয়। স্থানিক বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রেই সুফল দায়ী। কিন্তু বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা সে বিষয়টি কখনোই তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আনেন না। এরা যে কোন স্থানে যে কোন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলেই দেশ ও জাতির কল্যাণ হবে মনে করেন। তেমনি বিলাসী ভাবনার ফসল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এটি সারা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে নিজের মতো চরিত্রমণ্ডিত করে ফেলেছে। মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, তকমাধারীরা শিক্ষিত এবং বেকার এ কারণে যে, প্রতিযোগিতায় তারা সংখ্যা বাড়ায়, 'সম্পন্ন' হতে পারে না। তাছাড়া দেশের প্রতিটি মানুষকে সাদামাটা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতের সনদ দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়— বরং তাদের কর্মক্ষম করা এবং দেশের জন্য সম্পদে পরিণত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করতে বাধ্য। তাহলে শেষতক দোষটা রাষ্ট্রের ঘাড়েই পড়ছে। কেননা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে 'যত কথা' সব দায় এখন রাষ্ট্রপক্ষের, অন্যের নয়। কেননা অন্যরা এক্ষেত্রে আজ্ঞাবহ। উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কী সুকর্ম-কুকর্ম করেছে সেটি এখানে আলোচ্য নয়। বরং জাতীয় চরিত্রের বিশ্ববিদ্যালয় কী করতে পারত সেটিই আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য। বাংলাদেশ ছোট আকারের হলেও নানাবিধ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত সহবাসে সন্তুষ্ট। দেশব্যাপী বৈচিত্র্যের বিভেদের পরিবর্তে ঐক্যের ঐকতান বর্তমান। এটি প্রায় ক্ষেত্রেই স্থানিকতাকে গুরুত্বহীন করে তোলে। ফলে নীতিনির্ধারকরাও স্থানিকতার ঐশ্বর্যকে চিনতে, গুরুত্ব দিতে ভুল করে। সেটি যে কোন জাতির আনইভেন উন্নয়নের জন্য একটি কুশর্ত। এটি অনভিপ্রেত, কিন্তু চলছে। এটিকে অতিক্রম করা সম্ভব। তবে নিজস্ব ঢঙের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কিংবা বোঝা চাপিয়ে তা সম্ভব নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই স্থানিক বৈশিষ্ট্যে

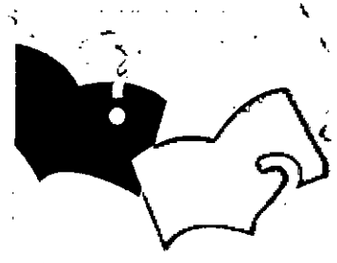

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই তা সম্ভব। বিকেন্দ্রীকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দৃষ্টিতে দুটি ভালো কাজ করতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে তার আওতাধীন অধিভুক্ত কলেজগুলোতে পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান এবং মানোন্নয়নের কাজ। সুষ্ঠু পরিদর্শনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, নীতি দূরবর্তী, নীতি সন্নিকটবর্তী। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পরিদর্শন করলে যেমন নিত্যকর্মযজ্ঞ সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়, তেমনি অতি দূরবর্তী পরিদর্শনে সমস্যাসংকুলতা বাড়ে এবং পর্দামুক্তি ঘটে না। বিভাগভিত্তিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সে ক্ষেত্রে একটি শিক্ষা পরিদর্শনের স্বাভাবিক উপায় হতে পারে। এটি আকস্মিক পর্যায়ে সমস্যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরসন করতে পারে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তও দিতে পারে। দ্বিতীয় যে ভালো কাজটি করতে পারে তা হচ্ছে, স্থানিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিষয়ক বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম সুন্দরবন সন্নিহিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় চালু করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সুন্দরবন হবে একটি প্রাকৃতিক পরীক্ষাগার। যেখানে বিভিন্নরকম নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও আবিষ্কারধর্মী গবেষণা কার্যক্রম চলতে পারে। এটি শুধু জাতীয় চাহিদাই নয়, বিদেশী ছাত্রছাত্রীদেরও চাহিদার পরিপূরক হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমুদ্রবিজ্ঞান এবং সামুদ্রিক বনভূমির স্বাভাবিক সম্পর্ক পড়তে ছাত্রছাত্রী আসতে পারে। তেমনি আমাদের পাহাড়ি জেলায় পাহাড়বিজ্ঞান এবং তৎসন্নিহিত ও জীবনবোধ, তার দর্শন ও বিজ্ঞান সবই পড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এরকমভাবে সিলেটে চা শিল্পের ওপরেও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এটি দেশী চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হবে। নদীমাতৃক দেশে নদীবিজ্ঞানের ওপর উচ্চশিক্ষার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালু নেই। কী লজ্জার কথা? আমরা আমাদের দেশীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মেরামতের জন্য সবসময়ই বিদেশীদের চোখের দিকে কিংবা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি এখনও আক্কেল না হয় তবে আরও বহু বছর এমনি করে পায়ে ধরা জীবনযাপন করতে হবে। প্রতিটি জাতি শিক্ষায় তার মতো স্বতন্ত্র এবং স্বাভাবিক। আমরা শিক্ষায় স্বাতন্ত্র্যহীন এবং অস্বাভাবিক। অনুসরণ এবং অনুকরণেও পঙ্কিলতা গ্রাস করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতে চাইনে। কিন্তু প্রসঙ্গত এসে যায়। এটি এখন সমস্যাক্রান্ত শুধু নয়, জাতীয় মূল্যবোধকেও আহত করছে প্রতিনিয়ত। এটির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক চিকিৎসা করা প্রয়োজন। প্রথমেই শিক্ষা প্রতারণা বন্ধ হওয়াটা জরুরি। যে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ায় না তারা অন্যের পড়াশোনা তদারক করে কী করে? এটি নৈতিকতার প্রশ্ন। দূর অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারও আগে সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা সহযোগিতা করত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তার পড়াত এবং বিশিষ্ট কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স পড়ানোতে সহযোগিতা করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার মানক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষার মানের অনুপাত নির্ধারণ করত। তাদের কাজের যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, নৈতিকতার মালিন্য তাদের স্পর্শ করেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়টি অবলীলাক্রমে উৎরে যেতে পারে স্থানিক পর্যায়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করে এবং তৎসন্নিহিত প্রথাসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে 'ভাগচাষের' সম্পর্ক তৈরি করে। যেহেতু একাডেমিক বিষয়টি প্রাধিকারপ্রাপ্ত, তাই স্থানিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বরি মেনে নেয়াটা সুস্থ হলেও কায়েমি স্বার্থবাদীদের স্বার্থের প্রতিকূল বিধায় এটির বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজনে 'পদক্ষেপ' ব্যতিরেকে এটি বাস্তবায়িত হবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক যেসব ব্যাখ্যাবলী আছে সেগুলোর বাস্তবায়নে কায়েমি স্বার্থবাদীরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের কথা তো বাতাসেও 'উড়তে' দিতে চায় না। কিন্তু কে কী চায়, তার উপরে তো নির্ভর করে দেশ চলবে না, দেশ চলবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত এবং বাঞ্ছার অনুজ্ঞায়। দেশ কী চায়। রাষ্ট্র কী করে সেটিই জনগণের দেখার বিষয়। ভাবনার এবং বিবেচনারও।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কল্যাণধর্মী করতে গেলে এটির উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম যেমন চালাতে হবে তেমনি স্থানিক পর্যায়ের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও নীতি ও কৌশল নির্ধারণের এবং অনুশীলনের সঙ্গী করতে হবে। তাহলে কখনোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্ভবত মুখ থুবড়ে পড়বে না। তা সম্ভব না হলে এটিকে ডিজমেন্টাল করে ফেলা ভালো। দিনে দিনে এর অকার্যকারিতা এবং কলংক-কালিমা যেভাবে অনাবৃত হচ্ছে তাতে পুরো জাতির মুখে চুনকালি প্রলেপিত হয়ে এটির ভাবমূর্তি 'মুক্তযাত্রার' কাহিনীতে পরিণত হবে এবং হাট-বাজারে রামযাত্রার পালা শুনতে সাধারণ মানুষ পুলক অনুভব করবে। কী করবে রাষ্ট্রপক্ষ? রামযাত্রা শুনবে না?

ড. ইশা মোহাম্মদ : *অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়*

তারিখ : 05 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২